Q:- নারীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা

Ans:→ বড়লাট পরিষদের আইন সদস্য ও শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি মিঃ জে. ই. ডি. বেথুন কয়েকজন বাঙালী নেতার সাহায্যে ১৮৪৯ খ্রী: মেয়েদের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যথা - কলকাতা ফিমেল স্কুল, হিন্দু ফিমেল স্কুল যা বেথুন বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়, ১৮৫০ খ্রী: বিদ্যাসাগর এই স্কুলটির সম্পাদকের দায়িত্ব নেন, ১৮৫৩ খ্রী: পুনর্গঠিত পরিচালক সভার অন্যান্য ছিলেন সিসিল বিডন তিনি পরিচালক হয়েছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর, অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কালীকৃষ্ণ দেব, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ,

১৮৫৪ সালে নারী শিক্ষার কিছু প্রসার হলে বিদ্যাসাগর বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেন, F. Haliday এর সাথে পরামর্শ করে ঠিক করেন যেসব গ্রাম স্কুল তৈরীর জন্য ঘর দেবেন সেখানে তিনি মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করবেন, ১৮৫৮ খ্রী: হুগলী জেলায় ২০টি, নদীয়াতে ১টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি স্কুল স্থাপন করেন। এই সকল স্কুলগুলির অর্থ জোগানোর জন্য তিনি "নারী শিক্ষার ভাণ্ডার" স্থাপন করেন,

১৮৫৩ খ্রী: তিনি বীরসিংহ গ্রামে একটি ইং-সংস্কৃত অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন।

Scanned with CamScanner

উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কয়েকজন বন্ধু 'কলকাতা ট্রেনিং স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁকেই সম্পাদক নির্বাচন করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুলটির নাম হল 'কলকাতা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি'। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলটি হল হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (পরবর্তীকালে শুধু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন)। এই প্রতিষ্ঠানে কোন সরকারী সাহায্য ছিল না। এটিই ছিল শুধু ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কলেজ যেখানে কেবল ভারতীয়রাই অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজ একটি দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায় এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি হয় প্রথম গ্রেড কলেজ। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এখানে আইন পড়ানো হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বি.এ. অনার্স এবং এম.এ. পড়ানো হয়। প্রতিষ্ঠানটির শ্যামপুকুর শাখা হল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, বৌবাজার শাখা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, বড়বাজার শাখা হল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। কলেজের আর্থিক সংকটের সময় এবং বিশেষ করে বাড়িঘর তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় প্রায় সবটাই বিদ্যাসাগর নিজে বহন করেন। এই সাফল্যই অন্যান্য ভারতীয়দের ইংরাজী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহ জুগিয়েছে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি তুলে দিয়ে আই. সি. এস. কর্মচারীদের পরীক্ষার জন্য যে পরীক্ষক বোর্ড তৈরী করা হয়, ঈশ্বরচন্দ্র সেই বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডেসপ্যাচ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি (University Committee) গঠিত হয়, তিনি সেখানেও সদস্য মনোনীত হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (Fellow) মনোনীত হন। (ঐ বছরই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।) ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট হন এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ প্রতিষ্ঠানের অছি পরিষদের (Board of Trustees) সদস্য হন। কর্মজীবনের এইসব সাল তামামী থেকে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং কর্মকাণ্ডের সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সংবাদপত্র জগতেও বিদ্যাসাগরের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পেপার কমিটির সদস্য ছিলেন। 'সর্বশুভকরী' পত্রিকাতেও তিনি লিখতেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক হলেও পত্রিকাটির পরিকল্পনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে যখন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা উঠে যাচ্ছিল, তখন তিনি সেটিকে বাঁচিয়েছিলেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হয়েছিলেন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ প্রতিষ্ঠানের জীবিতকাল পর্যন্ত তিনি সদস্য তো ছিলেনই, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটির শেষ সময়েও তিনিই ছিলেন সম্পাদক)।

Scanned with CamScanner

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদানের একটি প্রধান অংশ ছিল তাঁর সাহিত্য কৃতিকে অবলম্বন করে। আগেই বলা হয়েছে সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজ এবং উন্নত করবার জন্য তিনি লিখেছিলেন 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী' (৪ খণ্ডে), এবং 'ঋজু পাঠ'। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন 'বাসুদেব চরিত', ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বাংলার ইতিহাস', ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 'জীবন চরিত' এবং 'বোধোদয়', ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে 'বর্ণ পরিচয়', ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'শব্দমঞ্জরী' (শব্দ সংকলন অর্থাৎ অভিধান)। বোঝবার এবং ব্যবহারের সুবিধার জন্য তিনি বাংলা বর্ণমালা

Scanned with CamScanner

সংস্কারও করেন। তাঁর লেখা প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলি গণশিক্ষা এবং গণসাক্ষরতার সহায়ক হয়েছে, একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের অন্যান্য সাহিত্যকীর্তিও সর্বজনবিদিত। এসবের মধ্যে ছিল 'শকুন্তলা' (১৮৫৫), সীতার বনবাস (১৮৬২), 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ব্যবহারের জন্য তিনি লেখেন 'মেঘদূতম', 'অভিজ্ঞানম্', 'হর্ষ চরিতম' প্রভৃতি। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর দুইটি নিবন্ধ এবং বহু বিবাহ সম্বন্ধেও দুইটি নিবন্ধ বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিজীবি মহলে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বস্তুতপক্ষে বাংলা ভাষাকে ঘষে মেজে তিনি একে উন্নত চিন্তার বাহন করে তোলেন। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ অথবা বিদেশী সাহিত্যের ভিত্তিতে নতুন রচনাসমূহ সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে বিদেশী সাহিত্যের দরজা খুলে দেয়।

Scanned with CamScanner